সংলাপ প্রতিবেদন ১১৩

ভ্যাট ও এসডি অ্যাক্ট ২০১২

উদ্বেগ ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

প্রকাশক

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি - ৬/২ (৭ ও ৮ তলা), ব্লক - এফ
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, লালমাটিয়া হাউজিং এস্টেট
ঢাকা - ১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৯১৪১৭৩৪, ৯১৪১৭০৩, ৯১২৬৪০২, ৯১৪৩৩২৬, ৮১২৪৭৭০
ফ্যাক্স: (+৮৮ ০২) ৮১৩০৯৫১ ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রথম প্রকাশ মে ২০১৬

স্বত্ব © সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

প্রতিবেদনে উল্লেখিত মতামত একান্তভাবে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর বা অংশগ্রহণকারীদের সংশ্লিষ্ট সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।

টাকা ৩৫
USD 5

ISSN 1818-1538

C52016_2DR113_MPA

বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় অধ্যাপক রেহমান সোবহানের উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অংশীদারিত্ব ও জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজন সহ বিভিন্নমুখী কর্মকাণ্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার সপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার ওপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী, জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতি-নির্ধারকবৃন্দ, সরকারি আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডির লক্ষ্য হলো এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেসব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সিপিডিতে চলমান গবেষণাসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে: সামষ্টিক অর্থনীতি পর্যালোচনা; দারিদ্র্য, অসমতা ও সামাজিক নিরাপত্তা; কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন; বিনিয়োগের প্রসার এবং শিল্প কারখানা ও অবকাঠামোর উন্নয়ন; বাণিজ্য, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্বায়ন; জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ; উন্নয়নের জন্য সুশাসন, নীতিমালা ও প্রতিষ্ঠান; এবং ২০১৫-পরবর্তী বিশ্ব উন্নয়ন এজেন্ডা। এসব বিষয়ে কর্মরত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সিপিডি যৌথভাবে সংলাপ আয়োজনও করে থাকে।

নীতি গবেষণা ও সংলাপের ক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রম ও সার্বিক আবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ Think Tank Initiative-এর আওতায় বিশ্বব্যাপী এক প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার জন্য সিপিডি পর পর দুইবার নির্বাচিত হয়েছে। বেশ কিছু আন্তর্জাতিক তহবিল ও সরকারের গৃহীত এ যৌথ উদ্যোগটি পরিচালনা করে কানাডার ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (আইডিআরসি)।

সিপিডির গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডির একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচিও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে **সিপিডি সংলাপ প্রতিবেদন সিরিজ** (CPD Dialogue Report Series) প্রকাশ করে থাকে।

বর্তমান প্রতিবেদনটি ***ভ্যাট ও এসডি অ্যাক্ট ২০১২: উদ্বেগ ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ*** শীর্ষক সংলাপের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সংলাপটি ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ঢাকার সিক্স সিজন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করেছেন: *মাবরুক আহমেদ*, পাবলিকেশন অ্যাসোসিয়েট, সিপিডি।

নির্বাহী সম্পাদক: *মিজ আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, পরিচালক, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ, সিপিডি।
সিরিজ সম্পাদক: *অধ্যাপক রেহমান সোবহান*, চেয়ারম্যান, সিপিডি।

সংলাপ প্রতিপাদ্য

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) ১০ ডিসেম্বর ২০১৪, বুধবার 'মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২: উদ্বেগ ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক একটি সংলাপের আয়োজন করে। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন সিপিডি'র নির্বাহী পরিচালক *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান*। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী *জনাব এম এ মান্নান* এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)-এর সভাপতি *জনাব কাজী আকরামউদ্দিন আহমদ*। সংলাপে সিপিডির রিসার্চ ফেলো *জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান* মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা *ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম*, বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের প্রধান অর্থনীতিবিদ *ড. জাহিদ হোসেন*, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য *ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির হোসেন* ও সাবেক চেয়ারম্যান *ড. আব্দুল মজিদ*, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক *ড. আহসান হাবীব মনসুর*সহ বিশেষজ্ঞগণ।

সূচনা বক্তব্য

সূচনা বক্তব্যে সিপিডি'র গবেষণা পরিচালক *ড. ফাহমিদা খাতুন* আলোচনার প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, যে নতুন মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ তৈরি হয়েছে তার উপর বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের আলোচনার জন্য এ আয়োজন। তিনি স্মরণ করেন যে, সরকারের প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল ২০১৫ এর ১লা জুলাই থেকে আইনটি কার্যকর হবে, কিন্তু ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন পর্যায় এবং নানা স্তরের অংশীজনদের কাছ থেকে বেশ কিছু বিষয়ে আপত্তির কারণে সরকার আইনটি নিয়ে আরও আলোচনার সিদ্ধান্ত নেয়। এ আলোচনাকে সমৃদ্ধ করার নিমিত্তেই সিপিডি'র এ উদ্যোগ যেখানে উপস্থিত সকলে তাদের মতামত তুলে ধরতে পারবেন, এবং যার মাধ্যমে কিছু দিক নির্দেশনা পাওয়া যাবে।

সভাপতির বক্তব্য

সভাপতির বক্তব্যে *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান* উল্লেখ করেন যে, ১৯৯১ সাল থেকে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট চালু হয়েছে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে গত আড়াই দশক ধরে এ কর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। মূসক-এর অবদান মোট রাজস্ব আয়ে বর্তমানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের উপরে। ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে এ ধরনের কর যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বিনিয়োগেও এর ভূমিকা হতে পারে ইতিবাচক, কারণ কর এবং রাজস্ব নীতি বিনিয়োগকে প্রভাবান্বিত করে। বৈদেশিক পণ্যের সাথে স্থানীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার উপরও করনীতির ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব থাকতে পারে, সেদিক থেকে বাংলাদেশের কর ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা-বানিজ্যের ক্ষেত্রে মূসকের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। মূসক চালু হবার পর প্রায় দুই দশক অতিক্রান্ত হয়েছে, ফলে মূসক আইন-এর একটি পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ২০১২ সালে নতুন একটি মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন প্রণীত হয় এবং সে বছরে সেটি সংসদে পাশও হয়। নতুন আইনটি ২০১৫-এর জুলাই থেকে কার্যকর হবার কথা ছিল।

অধ্যাপক রহমান বলেন, যেহেতু রাজস্ব নীতি, বিশেষত মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক নীতি বিনিয়োগ এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনেকেই প্রস্তাবিত আইন সম্বন্ধে বিগত দু'বছর বিভিন্ন সময়ে ও প্ল্যাটফর্মে তাদের মতামত দিয়েছেন। এ আইনের সাথে একটি সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও জড়িত আছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন এবং এ সম্পর্কে উদাহরণ দিতে গিয়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর মূসক ও সম্পূরক শুল্ক-এর কী ধরনের প্রভাব পরে এ বিষয়টিকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, নতুন প্রস্তাবিত মূসক ও সম্পূরক শুল্ক-এর প্রেক্ষিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংস্থার উদ্বেগের বিষয়ে সিপিডির চিন্তা ভাবনা, এবং পরবর্তী করণীয়সমূহ বাস্তবায়ন করতে গেলে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে তা নিয়েই মূলত এ সংলাপে আলোচনা হবে।

অধ্যাপক রহমান সভাকে জানান, সর্বশেষ অক্টোবর মাসে এ আইনটি পুনর্বিবেচনার জন্য সরকার এনবিআর ও এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি করেছে; এফবিসিসিআই এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী সংস্থা সেখানে তাদের মতামত দিয়েছে। সবার মতামতকে ধারণ করে দু'মাসের ভেতরে কমিটির একটি রিপোর্ট দেবার কথা যার কাজ প্রায় সমাপ্তির দিকে। আলোচনা অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব ব্যাখা করে *অধ্যাপক রহমান* বলেন, আমন্ত্রিত অতিথিদের সবাই উৎপাদক, ভোক্তা ও নীতি-নির্ধারক হিসেবে নিজ নিজ অবস্থান থেকে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন। তাই এ বিষয় নিয়ে সিপিডি'র গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ উপস্থাপনার পর উপস্থিত সকলের আলোচনা ও সুচিন্তিত মতামত একটি সুপারিশমালা প্রণয়নে কাজে লাগবে যা পরবর্তীতে উল্লেখিত কমিটির কাজেও সহায়তা করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা

উপস্থাপনার শুরুতে *জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান* বলেন যে, উপস্থাপনাটি শুধুমাত্র আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো এবং প্রস্তাবিত আইনটির কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন তা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে প্রণীত নতুন মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, নতুন আইনটি ব্যবসায়ী এবং কর আদায়কারী দু'জনের জন্যই সহজতর করা, কর আহরণ ও ব্যবসা বান্ধব পরিস্থিতি তৈরি করা এবং কর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করার জন্য প্রণীত হয়েছিল। এ উদ্দেশ্যগুলোকে সামনে রেখে আইনটিকে আরও সংস্কারের জন্য ২০১২ সালে মূসক আইনটি 'ভ্যাট অ্যান্ড সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি অ্যাক্ট' হিসেবে সংসদে পাশ হয়। কিন্তু আইনটি পাশের পর থেকেই ব্যবসায়ীরা বলছেন যে, এ আইনটি বাংলাদেশে বাস্তবায়ন, বিশেষ করে ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সেমিনার আয়োজন করে ব্যবসায়ীরা তাদের উদ্বেগের বিষয়গুলো আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে ধরেছিলেন। সে সেমিনারে উপস্থিত মাননীয় অর্থমন্ত্রী একটি কমিটি করে মূসক আইনটিকে পুনর্বিবেচনা (রিভিউ) করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর ফলে আইনটি নিয়ে নতুন করে আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। আইনটিকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের, যেমন- ব্যবসায়ী, ভোক্তা এবং যারা কর আহরণ করেন তাদের জন্য সহজতর করা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে আরও অর্থনীতিবান্ধব করা যেতে পারে বলে *জনাব খান* মত প্রকাশ করেন।

১৯৯১ সালে বিক্রয় করের স্থলে মূসক প্রণয়ন করা হয়েছিল। তখন থেকেই রাজস্ব আহরণের সবচেয়ে বড় উৎস হিসেবে মূসক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটি গত ২৪ বছর ধরেই ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত আছে। তবে রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে মূসক-এর অবদান সাম্প্রতিককালে কিছুটা সংকুচিত হয়েছে। আয়কর আহরণের পরিমান আগের চাইতে অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দুটো উৎসের মধ্যে ব্যবধান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। এখন মূসক এবং আয়কর দুটো থেকেই প্রায় সমপরিমান রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে। ১৯৯১ সালের মূসক আইন সম্বন্ধে অনেকেই বলে থাকেন যে এটি সম্পূর্ণ একটি মূসক নয়। মূলত এ যুক্তিকে সামনে রেখেই ৪-৫ বছর আগে আইনটিকে আধুনিকায়নের প্রস্তাব করা হয়েছিল। বাংলাদেশের ১৯৯১ সালের মূসক আইনের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে: যেমন কুটির শিল্প, রপ্তানি এবং কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে মূসক-এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল; কিছু কিছু ক্ষেত্রে মূসক-এর হার শূন্য রাখা হয়েছিল; একইসাথে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক আরোপের প্রচলন ছিল। এর ফলে একাধিক মূসক (multiple VAT) হারও প্রয়োগ করার সুযোগ ছিল। একই সাথে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য টার্নওভার করের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ মূসকের ব্যবস্থা ছিল যা 'প্যাকেজ মূসক' বলে সমাধিক পরিচিত।

নতুন মূসক আইনে প্রথমত, আইনটিকে সহজ এবং মূসককে একক হারে রূপান্তরের চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক আইনের পরিধি আগের চাইতে অনেক বিস্তৃত হয়েছে। অর্থনীতির নতুন নতুন ক্ষেত্র, যেমন- সেবামূলক কার্যক্রম, লিজ, গ্রান্ট, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদিকে মূসক-এর আওতায় আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে মূসককে আবারও শূন্যতে রাখার বা রেয়াত দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। নতুন আইনের প্রথম খসড়ায় এ ব্যবস্থাটি না থাকলেও পরবর্তী খসড়ায় এ বিধান রাখা হয়েছে। অন্যান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলোর মধ্যে একটি হল মূল্য ঘোষণার মাধ্যমে মূসক আদায়ের ব্যবস্থাটিকে বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ আগে উদ্যোক্তা এবং রাজস্ব বোর্ড মিলে পণ্যের একটি দাম স্থির করার পর সেটির ওপর মূসক নির্ধারণ করা হতো, নতুন আইনে প্রকৃত বিক্রয়মূল্যের ওপর মূসক নির্ধারণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা যদি উপকরণের ওপর আগেই মূসক প্রদান করে থাকেন তবে তিনি মূসক ক্রেডিট পাবেন। নতুন আইনে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক এবং ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের জন্য বিদ্যমান প্যাকেজ মূসক প্রথা দুটোই বাতিল করা হয়েছে। এ আইনে সবাই একক হারে অর্থাৎ ঢালাওভাবে ১৫ শতাংশ হারে মূসক প্রদান করবে।

২০১২ সালের মূসক আইনের প্রয়োগ হওয়া শুরু হলে মূসক চালান এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এক ধরনের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির মাধ্যমে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হবে, যার ফলে উদ্যোক্তাদের আর রাজস্ব বোর্ড অফিসে গিয়ে চালান জমা দিতে হবে না। নতুন আইনে উইথহোল্ডিং মূসক ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে। এ আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হলো অনাদায়ী মূসক আদায়ের জন্য রাজস্ব বোর্ডকে কিছু অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। এ ক্ষমতাবলে রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনে ব্যাংক এ্যাকাউন্ট জব্দ ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্পদও জব্দ করতে পারবে এবং হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকদের এজন্য দায়ী করতে পারবে।

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তাদের ওপর মূসক-এর কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা নিয়ে সিপিডি পরিচালিত একটি গবেষণার উল্লেখ করেন *জনাব খান*। এ গবেষণাটি দক্ষিণ এশিয়ার পাঁচটি দেশে হয়েছিল এবং বাংলাদেশের অংশটি সিপিডি বাস্তবায়ন করেছিল। সে গবেষণায় দেখা গেছে যে, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তারা মূসক প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা অনীহা প্রকাশ করেন। তাদের কাছে মূসক-এর প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল মনে হয় এবং এ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হলে তাদের যে

ধরনের হিসাব-পত্র রাখতে হবে সেটিকে তারা তাদের ব্যবসায়ের দিক থেকে কাংক্ষিত বা উপযুক্ত মনে করেন না। ফলে তারা মূসক প্রদানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেন। একই সাথে তারা এটাও মনে করেন যে একজন উদ্যোক্তা যদি মূসক প্রদান করেন আর অন্য উদ্যোক্তা যদি মূসক প্রদান না করেন তাহলে তাদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য চলে আসে। এ গবেষণাটির জন্য পরিচালিত জরিপ থেকে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগই ২০১২ সালে প্রণীত আইন সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেন না এবং এ বিষয়ে তাদের প্রস্তুতিও নেই।

জনাব খান বলেন, নতুন আইন নিয়ে এফবিসিসিআই-এর উদ্বেগের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে তাদের মূল চারটি বক্তব্য পাওয়া যায়। প্রথমত, এ আইনটির ফলে একক হারে মূসক আদায় হবে এবং সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক প্রথা থাকছে না, অর্থাৎ হ্রাসকৃত মূল্যের ওপর আর মূসক প্রদান করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, প্যাকেজ মূসক বাতিল করা হচ্ছে। তৃতীয়ত, অনেক বেশি হিসাব-পত্রের প্রয়োজন হবে যার অধিকাংশই ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোক্তারা তাদের বর্তমান দৈনন্দিন ব্যবসায়ের কার্যক্রমে সংরক্ষণ করেন না। চতুর্থত, রাজস্ব বোর্ডকে প্রদত্ত নতুন ক্ষমতা অর্থাৎ ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার বিষয়ে এফবিসিসিআই বেশ উদ্বিগ্ন। এছাড়া ১৯৯১ সালের আইনে প্রচলিত অ্যাডভান্স ট্রেড কর এবং অগ্রিম মূসক যা ২০১২ সালেও বহাল আছে; এফবিসিসিআই এতে আপত্তি তুলে এগুলো বাতিলের দাবি জানিয়েছে।

জনাব খান বলেন, সামগ্রিকভাবে মূসক সংক্রান্ত আইনী প্রক্রিয়ায় যে সংশোধন আনা হচ্ছে সেটি মাত্র শুরু হচ্ছে। নতুন মূসক আইন প্রণয়ন ছাড়াও আরও দুটি আইন রাজস্ব বোর্ড খুব দ্রুত সংশোধন করতে যাচ্ছে– একটি প্রত্যক্ষ কর আইন ও অন্যটি আমদানি শুল্ক বিষয়ক আইন। এ দুটি আইনও একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পাশ হয়ে আসবে।

জনাব খান বলেন, বিশ্বের যেকোনো দেশের কর ব্যবস্থাপনার চারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। এটি একদিকে সরকারের আয়, অন্যদিকে সরকারের বিনিয়োগের জন্য অর্থের উৎস হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটিকে কর ব্যবস্থাপনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় না তা হল, কর ব্যবস্থাপনাকে সরকারের বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার। একই সাথে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে মূসক আইন প্রণয়ন করার সময় শেষোক্ত বিষয়গুলোর ওপর যথেষ্ট পরিমাণে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না বলে *জনাব খান* মন্তব্য করেন।

উপসংহারে *জনাব খান* সামগ্রিকভাবে চারটি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রথমত, মূসক আইন পরিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, পরিবর্তিত আইনগুলো প্রয়োগের ক্ষেত্রে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিতে হবে। *জনাব খান* অভিমত ব্যক্ত করেন যে, প্রস্তাবিত আইন প্রয়োগের জন্য রাজস্ব বোর্ডের পরিকল্পনা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। ফলশ্রুতিতে, শেষ পর্যায়ে এসে ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে সরকারকে তাদের উদ্বেগগুলো শুনতে হচ্ছে। তৃতীয়ত, এ ধরনের নীতি বাস্তবায়নে সরকার এবং করদাতাদের প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনীয় সময় দেয়া প্রয়োজন। সর্বশেষ, এ ধরনের বড় সংস্কারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জগুলো একবারে মোকবিলা না করে ধাপে ধাপে মোকাবিলা করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। নতুন মূসক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ ধরনের পদ্ধতি কিছুটা হলেও অনুসরণের চেষ্টা করা হয়েছে বলে *জনাব খান* মন্তব্য করেন। কারণ হিসেবে তিনি জানান যে, গত তিন চার বছর ধরে ১৯৯১ সালের আইনটিকে অনেকখানি পরিবর্তন করে ২০১২ সালের মূসক আইনের কাছাকাছি আনা হয়েছে। "১৯৯১ সালের মূসক আইনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি

এবং এই প্রক্রিয়া পরিবর্তন করতে হলে আমরা বড় ধরনের সমস্যায় পড়বো" - ব্যবসায়ীদের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে *জনাব খান* নতুন পদ্ধতির সাথে অভ্যস্ত হবার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার জন্য ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করেন। এছাড়াও যেকোনো ধরনের সংস্কার প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ওপর কি ধরনের প্রভাব পড়বে সে বিষয়টিও আরও গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা-নিরিক্ষা করার সুপারিশ করেন তিনি।

উন্মুক্ত আলোচনা

সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক: বর্তমান ও নতুন আইনের প্রেক্ষাপট

উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করে রাজস্ব বোর্ডের সদস্য *ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির হোসেন* বলেন, বর্তমানে সেবা প্রদানকারী ২৩টি খাতে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক প্রথা চালু আছে, কিছু পণ্যের ওপর ট্যারিফ মূল্য বহাল আছে। প্রকৃতপক্ষে, মূসক হল একটি অডিট/হিসাব ভিত্তিক পদ্ধতি যা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক এবং ট্যারিফ মূল্য প্রধান বাধা বলে *জনাব হোসেন* মনে করেন। এ ব্যবস্থা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট চেইন এবং ইনভয়েসের চেইনকেও বাধাগ্রস্ত করছে। তিনি জানান, রাজস্ব বোর্ডের হিসাব অনুযায়ী সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক ব্যবস্থা বাতিল করা হলেও কর দাতার নেট প্রদেয় মূসক একই থাকে। হিসাব-পত্র সঠিকভাবে রাখা হলে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে যে পরিমাণ কর দিতে হয় নতুন আইনে কাঁচামালের ওপর প্রদত্ত কর ফেরৎ পেয়ে যাবার পর ব্যবসায়ীদের করের পরিমান একই হবে। এতে তাদের ওপর মোট প্রযোজ্য করের পরিমান বাড়বে না। কিন্তু রাজস্ব বোর্ডের হিসাব চক্রটি পূর্ণ হবে। ট্যারিফ মূল্যের ক্ষেত্রেও হিসেব করে একই চিত্র পাওয়া গেছে। এ ট্যারিফ মূল্যও বাতিল করলে মূসক আইনটি অন্যান্য উন্নত দেশের আদর্শ মূসক আইনের মতই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় কর প্রদান এবং হিসাব ভিত্তিক হবে।

এ বিষয়ে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক *ড. আহসান হাবীব মনসুর* বলেন, সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক প্রথা পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। বাংলাদেশে বিশেষত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা ঠিকমতো হিসাব রাখতে পারেন না বলে এটি কৃত্রিমভাবে চালু হয়েছিল। মূসক ব্যবস্থার মূল বিষয়বস্তু হলো তথ্যের যোগসূত্র তৈরি করা, যেখানে একজন আরেকজন থেকে ক্রেডিট নেবে এবং এ সম্পর্কীয় তথ্য নথিভূক্ত থাকবে। সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক ব্যবস্থা চালু করার ফলে তথ্যের যোগসূত্র নষ্ট হয়, অডিট এবং ক্রস চেকিং-এর ক্ষেত্রে এটি জটিলতা তৈরি করে। বর্তমান আইনে সবাই সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক এর সুবিধা পায় না, যার ফলে সবার ওপর আইনের সমান প্রয়োগ হয় না। তাই নতুন আইনে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক প্রথা তুলে দেয়া হয়েছে যা ড. মনসুর সমর্থন করেন।

এ বিষয়ে এসএমই ওনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি *আলী জামান* বলেন, মূসক- প্রয়োগের সুস্পষ্ট সুযোগ যেসব জায়গায় ছিল না অথবা প্রয়োজনীয় হিসাব বা দলিলপত্রের অভাবে যেসব ক্ষেত্রে সংযোজিত মূল্যের পরিমাণ জানা যেতো না সেসব ক্ষেত্রে বর্তমান আইনে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক পদ্ধতি চালু আছে। তাঁর সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনি বলেন, তাঁরাও উৎপাদনখাতে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক ব্যবস্থা সমর্থন করেন না। কিন্তু তিনি দাবি করেন যে, তাদেরকে যেন স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয় মূসক সংযোজিত মূল্যের ওপর নাকি টার্নওভারের উপর হিসাব করা হবে। সংযোজিত মূল্যের উপর ৩ শতাংশ হারে মূসক আদায় হলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সেটি সমর্থন করেন। কিন্তু টার্নওভারের উপর ৩ শতাংশ হারে মূসক আদায় করা হলে মোটের ওপর মূসক অনেক বেশি হারে প্রজোয্য হবে। এছাড়া মূল্য

সংযোজন হিসাব করা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য খুব কঠিন। কারণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা কোনো কাঁচামাল আমদানি করতে পারে না এবং করার সামর্থও নেই, ফলে তারা অভ্যন্তরীণ বাজার থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে যার রসিদ রাজস্ব বোর্ডের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়না। ফলে তারা রেয়াতও পায় না। এ প্রসঙ্গে *জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন* বলেন, নতুন মূসক পদ্ধতি অনুযায়ী একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে বাজার থেকে কাঁচামাল কেনার সময় বিক্রেতা তাকে মূসক এগার ইস্যু করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন যে, মূসক এগার চালু হলে ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায়ীরা মূসক-এর রেয়াত, কনসেশন এ সব কিছুর সুবিধা পাবে ফলে তাদের আর নতুন আইন নিয়ে আপত্তি থাকবে না। নতুন আইনে রাজস্ব বোর্ড এটি নিশ্চিত করবে বলে বলা হয়েছে। তবে কার্যক্ষেত্রে এ আইন কতটা প্রয়োগ করা সম্ভব হবে এ ব্যাপারে *জনাব শাহাবুদ্দিন* সন্দেহ প্রকাশ করেন।

বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা *ফেরদৌস আরা বেগম* এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, নতুন আইনের অধীনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা সরাসরি আমদানি করতে পারবেন। ফলে আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত মূসক- এর দলিল তাদের কাছে থাকবে এবং তারা রেয়াতও পেয়ে যাবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা *ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম* বলেন, টার্নওভার মূসকও একধরনের সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক। নতুন আইনে কিছু কিছু ক্ষেত্রে টার্নওভার মূসক থাকার ফলে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যে মূসক আরোপ পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায়নি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

প্যাকেজ মূসক ও নতুন আইনে তা বাতিলের যৌক্তিকতা

প্যাকেজ মূসক বিষয়ে *ড. আহসান হাবীব মনসুর* বলেন, এ খাত থেকে সরকার বছরে মাত্র ৯ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করে যা মোট রাজস্ব আহরণে খুব সামান্য অবদান রাখে। দেশের সমস্ত ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা একত্রে বছরে এই পরিমাণ মূসক দিয়ে থাকে। *ড. মনসুরের* মতে এটি অন্যায্য, তাই এটি বাতিল করা যথাযোগ্য হয়েছে। তাঁর মতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের যথাযথভাবে মূসক প্রদান করা উচিত।

এ বিষয়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প মালিক সমিতির সভাপতি *আলী জামান* বলেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্যাকেজ মূসক প্রথার বিরুদ্ধে। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১৯৯১ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে কোনো মূসক আরোপ করা হবে না। তা সত্ত্বেও পাইকারী ও খুচরা পর্যায়ে প্রথমে ১.৫ শতাংশ হারে প্যাকেজ মূসক ধার্য করা হয় যা শেষ পর্যন্ত গিয়ে ৪ শতাংশে দাঁড়ায়। এটি মূল মূসক ১৫ শতাংশের বাইরে অতিরিক্ত ৪ শতাংশ মূসক। *জনাব জামান* বলেন, আমদানি পর্যায়ে মূসক প্রদানে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প মালিকদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এ ধরনের মূসক আরোপ তাদের জন্য ব্যবসাবান্ধব নয়। কারণ এতে যে পরিমাণ হিসাব সংরক্ষণ করতে হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা এসব শিল্পের মালিকদের নেই।

অংশীজনদের সাথে আলোচনা ও তার ফলাফল

ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির হোসেন বলেন, ২০০৯ সালে খসড়া আইন প্রণয়নের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সেটি নিয়ে সারা দেশে অংশীজনদের পরামর্শ নেয়ার জন্য ১০-১১টি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও করদাতাবান্ধব এবং এ ব্যবস্থা হয়রানিমুক্ত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শগুলো খসড়া আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী আইনটিকে সংক্ষিপ্ত করে এর বিস্তারিত অংশ বিধি হিসেবে রেখে পুনরায় খসড়াটি মন্ত্রীসভায় পাঠানো হয়। মন্ত্রীসভা খসড়াটিকে নীতিগত অনুমোদন দিয়ে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টার নেতৃত্বে এবং রাজস্ব বোর্ড ও এফবিসিসিআই-এর সদস্যদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেয়। কমিটি আইনটির বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তুত করে পুনরায় মন্ত্রীসভায় প্রেরণ করে।

ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির হোসেনকে সমর্থন করে *ড. আহসান মনসুর* বলেন, অংশীজনদের সাথে যথাযথভাবে আলোচনা না করার অভিযোগটি খুবই দুঃখজনক। কারণ খসড়া আইনটিকে নিয়ে সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে। এরপর প্রধানমন্ত্রীর অর্থ উপদেষ্টার নেতৃত্বে গঠিত কমিটিতে আবারও আলোচনা হয়েছে। সেখানে অনেক মতপার্থক্য দূর করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অংশীজনদের সকল মতামত আইনে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ তা করা হলে বর্তমান আইনের বিধানই প্রয়োগ করা হত, নতুন আইনের তেমন কোনো তাৎপর্য থাকত না।

এ প্রসঙ্গে এফবিসিসিআই-এর সভাপতি *কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ* বলেন, ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করা হয় ঠিকই কিন্তু সে আলোচনার প্রতিফলন আইনে দেখা যায় না। নতুন যে কমিটি গঠন করা হয়েছে সেটিও আইনটি নিয়ে ব্যবসায়ীদের আপত্তির কারণেই হয়েছে। *জনাব আহমেদ* আরও বলেন, ব্যবসায়ীরা কর দিতে আগ্রহী। কিন্তু কর দেয়ার জন্য করদাতাবান্ধব ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার, জনগণ ও ব্যবসায়ী- সবার জন্যই মঙ্গলজনক ও সহজসাধ্য হয়, সেরকম একটি আইনই ব্যবসায়ীদের দাবি। *জনাব আহমেদ* বর্তমান কমিটির সুপারিশে ব্যবসায়ীদের উদ্বেগের জায়গাগুলোকে যথাযথভাবে সমাধান করা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

জনাব *আলী জামান* বলেন, অংশীজনদের আলোচনায় মনে হচ্ছিল যেন মূসক প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে সরকারের বৈরিতা রয়েছে। কিন্তু এটি মূল বিষয় নয়। মূসক প্রদান করেন ভোক্তারা। ব্যবসায়ীরা তাদের কাছ থেকে কেবল মূসক আদায় করেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই ভোক্তারা মূসক পরিশোধ করতে চান না। সে ক্ষেত্রেই সমস্যা সৃষ্টি হয়।

রাজস্ব বোর্ড-এর সাবেক চেয়ারম্যান *ড. আব্দুল মজিদ* বলেন, ২০০৯ সালে খসড়া প্রণয়নের সময়ই সকল অংশীজনদের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। কিন্তু আইন প্রণয়নের পর বিভিন্ন অংশীজন তাদের আপত্তির কথা জানান। এ সমস্যা সমাধানের জন্য *জনাব মজিদ* ২০০৯ সালের খসড়া আইনের সাথে ২০১২ সালের আইনের তুলনা করে এ দুইয়ের মধ্যে মৌলিক কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা খুঁজে দেখার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশে যে কোনো আইন প্রণয়নের পর তার প্রভাব নিয়ে গবেষণা হয় এবং অংশীজনদের সাথে আলোচনা হয়। তাই আইন প্রণয়নের আগেই সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে গবেষণা জরুরি বলে *ড. মজিদ* মত প্রকাশ করেন।

সুশাসনের জন্য প্রচার অভিযান-সুপ্র-এর পরিচালক *জনাব এলিসন সুব্রত বাড়ৈ* বলেন, মূসক প্রদান করেন ভোক্তারা। আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সাথে আলোচনা করে তাদের মতামত নেয়া হয়েছে। কিন্তু এ মূসক যারা পরিশোধ করেন, সে ভোক্তাদের সাথে কখনোই আলোচনা করা হয়নি। মূসক-এর ক্ষেত্রে ভোক্তাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করে *জনাব সুব্রত* তাদের সাথে আলোচনা করার ও তাদের মতামত নেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সুপ্র-এর একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করে *জনাব সুব্রত* আরও বলেন যে, মূসক বিষয়ে সাধারণ ভোক্তারা তেমন কিছুই বোঝে না। এমনকি তারা অনেকে জানেই না যে একটি ভোগ্য পণ্য কেনার সময় সে সরকারের কোষাগারে রাজস্ব দিচ্ছে। তাই এ বিষয়ে সাধারণ ভোক্তাদের সচেতন করা এবং নতুন আইনের ফলে তাদের ওপর কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি পরামর্শ দেন।

নতুন আইনে রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা

ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির হোসেন বলেন, ১৯৯১ সালের আইনে মূল্য অনুমোদনের একটি বিধান ছিল যার অধীনে রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তা মূল্য ঘোষণা করতেন। এ বিধানটিকে হয়রানিমূলক বিবেচনা করে নতুন আইনে এটিকে বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া কোনো ব্যবসায়ীর যদি সারা দেশে একাধিক অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকে তবে বর্তমান আইনের অধীনে তাকে তার অফিস বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যতগুলো এলাকায় আছে তার প্রত্যেকটি এলাকার মূসক অফিসে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় এবং পৃথকভাবে প্রত্যেক এলাকায় মূসক দিতে হয়। এ ব্যবস্থা ব্যবসায়ীদের জন্য জটিলতার সৃষ্টি করে। তাই নতুন আইনে একক রেজিস্ট্রেশন এবং অনলাইনে মূসক প্রদানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এর ফলে ব্যবসায়ীরা হিসাব করে তাদের প্রদেয় সম্পূর্ণ মূসক অনলাইনে যে কোনো এক স্থান থেকে প্রদান করতে পারবেন। এছাড়াও বর্তমান আইনে একাউন্ট কারেন্টের একটি ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থায় মূসক প্রদেয় হবার আগেই একজন করদাতাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সরকারের কোষাগারে জমা দিতে বাধ্য করা হয়। এ ব্যবস্থা অন্য কোনো দেশে নেই এবং এটি একজন ব্যবসায়ীর তারল্য প্রবাহের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বলে নতুন আইনে এ বিধানও বাতিল করা হয়েছে। বাংলাদেশে করদাতা এবং রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তাদের মধ্যে আস্থার অভাব রয়েছে উল্লেখ করে *জনাব জাহাঙ্গির* বলেন, এ কারণে করদাতাদের যাতে যতটা সম্ভব কম রাজস্ব বোর্ডের অফিসে যেতে হয় সে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এবং পুরো মূসক প্রদান ব্যবস্থাকে অনলাইনে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন একজন করদাতা তার নেট প্রদেয় মূসক নিজেই ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা ব্যাংক দ্বারা সার্টিফাইড চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন।

এফবিসিসিআই-এর পরিচালক *জনাব সিদ্দিকুর রহমান* বলেন, আইনে বলা আছে মূসক রেজিস্ট্রেশনের সনদ একজন ব্যবসায়ীর অফিসে দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখতে হবে। অনেক সময়ই রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা বলেন যেস্থানে মূসক রেজিস্ট্রেশন সনদ টাঙ্গানো হয়েছে সেটি দৃশ্যমান নয় এবং এজন্য তারা জরিমানা আদায় করেন।

ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির জানান যে নতুন আইনে মূসক আদায়ের সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হবে। রাজস্ব বোর্ড-এর সহকারি কমিশনার থেকে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে মাল ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করার আগে অনেকগুলো ধাপ অনুসরণ করা হবে। যদি কোনো ব্যবসায়ীর মূসক ফাঁকি দেয়ার বিষয়টি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে তাকে একটি নোটিশ দেয়া হবে। সে নোটিশ অনুযায়ী ব্যবসায়ী তার সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তার কাছে উপস্থাপন করে তার মূসক প্রদানের বিষয়টি প্রমাণ

করতে পারেন। এছাড়া একজন ব্যবসায়ী অন্য কোনো রাজস্ব বোর্ড কর্মকর্তার অফিসে মূসক প্রদান করে থাকলে সে অফিসের সাথে যোগাযোগ করে নির্ধারিত অফিসে প্রাপ্য মূসক আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে; অথবা ব্যবসায়ীর কোনো পণ্য কাস্টমসে থাকলে সে অফিস থেকে মূসক আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে। এ সকল প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও যদি মূসক আদায় সম্ভব না হয় কেবলমাত্র তখনই একজন ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার প্রশ্ন আসবে।

এ বিষয়ে *জনাব সিদ্দিকুর রহমান* মনে করেন রাজস্ব বোর্ডকে প্রদত্ত এ বিশেষ ক্ষমতার অপব্যবহার হবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই আইনে এর একটি সুরক্ষা থাকা প্রয়োজন। এজন্য আদালতে দু'পক্ষের শুনানির পরই কেবলমাত্র ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা মাল জব্দ করার বিধান রাখা উচিত বলে *জনাব রহমান* মত দেন। তিনি আরও বলেন যে রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তার এই জব্দ করার কাজে র‍্যাব ও পুলিশের সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এটি ব্যবসায়ীদের জন্য ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করবে যা তাদের দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে।

ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম ও এ বিষয়ে এক মত পোষণ করে বলেন এ বিধান মোটেই ব্যবসাবান্ধব নয়। কেউ অন্যায় করলে তাকে জরিমানা করা যেতে পারে, জেল দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করা হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হবে। অনেক সময়ই ক্ষুদ্র, মাঝারি এমনকি বড় ব্যবসায়ীরাও ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক কাজের জন্য একটি ব্যাংক একাউন্টই ব্যবহার করেন। এ ধরনের ক্ষেত্রে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হলে একজন ব্যবসায়ীর ওপর অনভিপ্রেত সমস্যা তৈরি হবে, তার ব্যক্তিগত ও পরিবারিক ব্যয় মেটানোও দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। তাই নতুন আইনে এ বিধানটি ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে বলে *ড. ইসলাম* মত দেন।

ড. ইসলাম আরও জানান, ২০০৭ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা থাকাকালীন আইএমএফ-এর একটি মিশন মূসক ব্যবস্থাকে সংস্কার করার পরামর্শ দিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে মূসক ব্যবস্থা প্রয়োগ করার প্রারম্ভেই বেশ কিছু দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। তাই মূসক ব্যবস্থাকে সংস্কার করে তেমন কোনো সুফল পাওয়া যাবে না বলে আইএমএফ-এর সেই মিশনকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

অর্থ ও পরিকল্পণা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী *জনাব এম এ মান্নান* বলেন, ব্যাংক একাউন্ট জব্দ করাকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি চরম ব্যবস্থা বলে মনে করেন। আদালতের নির্দেশ ছাড়া এটি কখনোই করা উচিত নয়, কারণ এখানে একজন ব্যবসায়ীর অন্যান্য সম্পদও থাকতে পারে।

ড. আবদুল মজিদ বলেন, আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে সকল পক্ষের একটি মানসিক প্রস্তুতি থাকা দরকার। কর দাতা এবং কর গ্রহীতা- দু'পক্ষেরই দৃষ্টিভঙ্গি সুশীল, সুনিয়ন্ত্রিত এবং সৃজনশীল হওয়া প্রয়োজন। যে দেশে আইন তৈরি করা হচ্ছে আইনটি সে দেশের জন্য উপযোগী কিনা এবং সেটি প্রয়োগ করা যাবে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।

কর আইন, করপ্রদান পদ্ধতি ও এ বিষয়ক কাগজপত্রগুলো অত্যন্ত জটিল বলে *জনাব মান্নান* মনে করেন। তিনি বলেন, রাজস্ব বোর্ড যে ফরম ও ম্যানুয়াল তৈরি করে সেগুলো বোঝা দুষ্কর। তাই উন্নত দেশগুলোতে যেভাবে এ সম্পর্কিত কাগজপত্র তৈরি হয় তা অনুসরনের পরামর্শ দেন তিনি।

আইনের ব্যাখ্যার জটিলতা ও কর আদায়ে কর কর্মকর্তাদের ভূমিকা নিয়ে *জনাব মান্নান* তার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন। তিনি জানান, ১৫-২০ বছর আগে তিনি বিদেশ থেকে একটি ছোট্ট এলসিডি এনেছিলেন, তখন এলসিডি খুব বেশী পরিচিত ছিল না। যে সময়ে বিভিন্ন মাপের টেলিভিশন বিদেশ থেকে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হারে কর রেয়াত দেয়া হতো। তিনি এ রেয়াত দাবি করলে কর কর্মকর্তা বলেন যে, এটি টেলিভিশন নয়, এলসিডি। এলসিডির ওপর কোনো রেয়াত প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এলসিডি যে একটি ভিন্ন প্রযুক্তির টেলিভিশন এটি তার খাতাতেও নেই, তার জানাও নেই। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য করদাতাদের সাথে সাথে কর কর্মকর্তাদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে *জনাব মান্নান* মন্তব্য করেন।

জনাব এলিসন সুব্রত রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে রাজস্ব বোর্ডের কাঠামোর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন রেখে বলেন, রাজস্ব আহরণ করার জন্য রাজস্ব বোর্ডের যে বর্তমান কাঠামোটি আছে তা নতুন মূসক বা নতুন আইন প্রয়োগ করবার জন্য কতটা প্রস্তুত সেটি বিবেচনা করতে হবে। কারণ কর সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষের অনেক প্রশ্ন ও বিভিন্ন ধরনের ভীতি আছে। এখনও কর কর্মকর্তাকে সাধারণ মানুষ ভয় পায় অথবা কর দিতে যাবে কিনা তা নিয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকে। কারণ করদাতাদের মধ্যে আতঙ্ক থাকে যে কর দিতে যেয়ে আবার নতুন কোনো বিপদে পড়ে কিনা। এ কাঠামো থেকে কিন্তু আমরা বের হয়ে আসতে পারি নি। যদিও সরকার এখন প্রতিবছর করমেলা করে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। সুতরাং কাঠামোগতভাবে এবং প্রযুক্তিগতভাবে রাজস্ব বোর্ড কতটা তৈরি অবস্থায় আছে সেটিও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে।

রাজস্ব বোর্ড-এর সাবেক সদস্য *জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন* বলেন, মূসক প্রদান করা নিয়ে ব্যবসায়ীদের দিক থেকে যতটা আশঙ্কা প্রকাশ করা হচ্ছে তার মূল কারণ হচ্ছে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা। রাজস্ব বোর্ডে- যারা আইন প্রণয়ন করছেন আর কর কর্মকর্তা যারা এ আইন ব্যবহার করছেন এ দুইয়ের মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সেখান থেকেই অবিশ্বাস আর আশঙ্কার প্রশ্ন আসছে। *জনাব শাহাবুদ্দিন* ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের রেয়াত বিষয়ে তার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে জানান, ইন্টারনেট সেবা যারা প্রদান করে তারা টেলিফোন সংস্থা (টিএনটি) থেকে ব্যান্ডউইথ ক্রয় করেন। কর কর্মকর্তারা বলছেন ব্যান্ডউইথ আর আইপিএস একই জিনিস অতএব আইপিএসে ৮০ শতাংশ রেয়াত সুবিধা পেলে ব্যান্ডউইথে এ রেয়াত নেয়া যাবে না। আইনে প্রতিটি পণ্যের জন্য রেয়াতের পরিমাণ নির্দিষ্টভাবে লেখা আছে, যেমন, ফ্যাক্সের জন্য ৮০ শতাংশ, এবং টেলিফোনের জন্য ৮০ শতাংশ রেয়াত। কিন্তু ব্যান্ডউইথের নাম লেখা নেই, বলা আছে ইন্টারনেট সেবার জন্য ৮০ শতাংশ। ব্যান্ডউইথ এ তালিকার বাইরে রয়ে গেছে, অথচ তার ১০০ শতাংশ রেয়াত সুবিধা পাবার কথা। কিন্তু গত দুই বছর ধরে রাজস্ব বোর্ড তাদের এ রেয়াত দিচ্ছে না এবং পুরো সময়টা ধরেই তারা রেয়াত পাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৫ শতাংশ একক মূসক হার অতিরিক্ত নাকি ন্যায্য

বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ *ড. জাহিদ হোসেন* বলেন, একটি বিতর্ক আছে যে একক মূসক হার হিসেবে ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত কিনা। এ প্রসঙ্গে তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মূসক-এর হারের তুলনা করে বলেন বিশ্বের সর্বোচ্চ হার হাঙ্গেরিতে যা ২৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন অ্যান্ডোরাতে ৪ শতাংশ হারে মূসক আদায় করা হয়। মূসক-এর

হার থাইল্যান্ডে ৭ শতাংশ, ফিলিপাইনে ১২ শতাংশ এবং চীনে শতাংশ ৬-২০ শতাংশ। সবচেয়ে সাধারণ হার ১৫-২০ শতাংশ। এ হিসেবে আমাদের দেশে প্রস্তাবিত ১৫ শতাংশ খুব একটা বেশি নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

ড. *জাহিদ হোসেনের* সাথে ভিন্নমত পোষণ করে *মিজ ফেরদৌস আরা* বলেন, জাপানে মূসক-এর হার ৫-৮ শতাংশ বেলজিয়ামে ৬ ও ১২ শতাংশ, সুইডেনে ৬, ১২ ও ১২.২৫ শতাংশ, ফ্রান্সে ২.১, ৫.৫, ১০ ও ২০ শতাংশ। এখানে হাঙ্গেরি একমাত্র ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের জন্য ১৫ শতাংশ হার অতি উচ্চ। ১৯৯১ সালে যখন ১৫ শতাংশ হারে মূসক চালু করা হয়েছিল তখন ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে বারম্বার বলা হয়েছিল যে মূসক-এর এ হার বেশ উঁচু। তখন রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, যেহেতু মূসক সকল ক্ষেত্রে না রেখে কেবলমাত্র কিছু নির্দিষ্ট খাতে রাখা হয়েছে তাই এ হার উচ্চ পর্যায়ে রাখা হয়েছে। খুচরা পর্যায়েও মূসক আরোপ করা হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ হার কমে আসবে। রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে করের প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ট্যাক্স ক্রেডিট নিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উচ্চহারের প্রভাব কমে আসবে।

প্রাক্তন অর্থসচিব, *জনাব সিদ্দিকুর রহমান* বলেন, ১৫ শতাংশ হারে মূসক মূলত পরিশোধ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। মূসক-এর এ অতিরিক্ত হারের কারণে তারাই বেশি ভুক্তভোগী হন। এ কারণে কেউ হয়তো না খেয়ে মারা যায় না, কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সঞ্চয় হ্রাস পায়। এতে তাদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এ বিষয়টি বিবেচনার জন্য *জনাব রহমান* রাজস্ব বোর্ডকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

এ প্রসংঙ্গে *জনাব এলিসন সুব্রত* সভাকে জানান যে, সুপ্র'র পক্ষ থেকে তারা প্রত্যক্ষ করের আওতা বাড়ানোর কথা বলছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশে করদাতা সনাক্ত করণ নম্বর (টিআইএন) থাকার কথা প্রায় ১ কোটি মানুষের, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আছে মাত্র ১৫ লক্ষ। মূসক চাপিয়ে দেয়া সহজ বলেই এটির হার ও আদায় বৃদ্ধির কথা বলা হয় বলে মত দেন *জনাব সুব্রত*। তাঁর মতে মূসক-এর আলোচনার চেয়ে প্রত্যক্ষ কর নিয়ে বেশি আলোচনা হওয়া উচিত।

এ প্রসঙ্গে ড. *আব্দুল মজিদ* টিআইএন এর কথা উল্লেখ করে বলেন যে এ পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল কর প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার উদ্দেশ্যে। টিআইএন ১৫ ডিজিটের একটি নম্বর যেটা খুললেই নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি, আয়, কর বা মূসক সম্পর্কিত সব তথ্য জানা যায়। এর সাথে মূসক নিবন্ধন নম্বর যুক্ত করা যেতে পারে। তথ্যের এই যোগসূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এমন হতে পারে যে কেউ মূসক দেওয়ার সময় তার আর্থিক অবস্থাকে একভাবে এবং আয়কর দেবার সময় অন্যভাবে তুলে ধরে থাকতে পারে। টিআইএন এর মাধ্যমে দুই জায়গার তথ্যের ভিন্নতা ধরা পড়তে পারে।

ড. *এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম* বলেন, মূসক প্রচলন করা হয়েছিল রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য। মূসক নিয়ে ড. *ইসলাম* তাঁর একটি গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এশিয়ার যেসব দেশে মূসক প্রচলন করা হয়েছিল সেসব দেশে মূসক প্রথম দিকে রাজস্ব আহরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও পরবর্তীতে এ হার কমে গেছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ড. *ইসলাম* জানান, বেশিরভাগ দেশেই মূসক-এর হার ১৫ শতাংশের নিচে। এশিয়ার মধ্যে জাপান, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরে মূসক এখনো প্রচলিত হয়নি। এসব দেশে ৪ শতাংশ হারে বিক্রয় কর চালু আছে।

চীনে এটি ৬-২০ শতাংশের মতো। অনেক দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, হার কম হলে মূসক আদায় বেশি হয়। সুতরাং হয়তো হার কমালে বাংলাদেশেও রাজস্ব আহরণ বাড়তে পারে। এছাড়াও মূসক-এর হার কম হলে সমতা ও মূল্যস্ফীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব কম হবে। বাংলাদেশে যেহেতু আইনটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে তাই মূসক-এর হার কমানোর এটাই উপযুক্ত সময় বলে মত দেন *ড. ইসলাম*।

ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির হোসেন বলেন, আইএমএফ কর্তৃক প্রকাশিত বই 'মডার্ন মূসক'-এর হিসাব থেকে দেখা যায় সারা পৃথিবীতে মূসক-এর গড় হার ১৬.৫ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নে বহুবিধ মূসক প্রচলিত আছে। উন্নত দেশগুলোতে তিনটি খাতকে মূসক-এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে: মৌলিক শিক্ষা, মৌলিক খাদ্য এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা। অন্যান্য বেশ কিছু খাতে হ্রাসকৃত মূসক হার রাখা হয়েছে। কিন্তু সেসব দেশে যেসব খাতে হ্রাসকৃত হারে মূসক রাখা হয়েছে আমাদের দেশে ওই খাতে মূসক একেবারেই রাখা হয়নি। *জনাব হোসেন* ক্যানন অফ ট্যাক্স (canon of tax) এর উল্লেখ করে বলেন, যারা ইতোমধ্যে করের আওতাভূক্ত হয়েছেন রাজস্ব বোর্ড তাদের ওপর করের বোঝা বাড়াতে চায় না। রাজস্ব বোর্ড অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রকেই করের আওতায় আনতে চায়। এর ফলে করের ভিত্তি এবং স্বেচ্ছাকৃতভাবে কর প্রদানের প্রবণতা বাড়বে। আর এ দুটি বাড়লে রাজস্ব বোর্ড এর রাজস্ব আহরণের মোট পরিমাণও বেড়ে যাবে।

মূসক-এর হার বিষয়ে *জনাব এম এ মান্নান* বলেন, বাংলাদেশে মূসক-এর হার ১৫ শতাংশ, ড. জাহিদ বলেছেন অন্যান্য দেশে এটি ২৭ শতাংশ পর্যন্ত আছে। *ড. ইসলাম*ের পরামর্শের বরাত দিয়ে মূসক-এর এ হার কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে বলে *জনাব মান্নান* ব্যক্তিগতভাবে মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির যে অবস্থা তাতে মূসক-এর হার বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি বেড়ে যেতে পারে। আবার যেহেতু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভোগ্যপণ্যের ওপরই মূসক আরোপ করা হয়, ভোগ্যপণ্যের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভোক্তারা অনেক ক্ষেত্রেই নিরুৎসাহিত হতে পারেন। এই বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিয়ে মূসক-এর হার নির্ধারণ করা যেতে পারে।

রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূসক ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন

ড. আহসান মনসুর বলেন, বাংলাদেশে নিবন্ধিত মূল্য সংযোজন করদাতার সংখ্যা ৭ লাখ। কিন্তু রিটার্ন জমা দেন মাত্র ৩৫ হাজার করদাতা। এ কর দিয়ে সরকারের প্রশাসনের খরচ চালানো যায় না। ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কর প্রদান না করা হলে এবং তা আদায়ের জন্য সরকারের উদ্যোগ না থাকলে, কর আদায় বাড়ানো বা মূসক আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। *ড. মনসুর* আরও বলেন, রাজস্ব আদায় বাড়ানোর লক্ষ্যে, মূসক ব্যবস্থাকে আধুনিকায়নের জন্য একটি আধুনিক মূসক আইনের কোনো বিকল্প নেই। এটি করা না গেলে একসময় চড়া মাশুল দিতে হবে। বাংলাদেশে কর ও জাতীয় আয় এর অনুপাত খুবই কম, মাত্র ১০.৫ শতাংশ। কর আইন সংস্কার ছাড়াও এ অনুপাত আগামী ২০-৩০ বছর বজায় রাখা সম্ভব। তবে *ড. মনসুর* স্মরণ করিয়ে দেন, সরকারের অনেক উচ্চাভিলাসী পরিকল্পনা আছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থের প্রয়োজন। মূসক আইনের সংস্কারের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ছাড়া এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। *ড. মনসুরের* বক্তব্য সমর্থন করে *ড. জাহিদ হোসেন* বলেন, ইদানিংকালে সরকারি ব্যয়ের কাঠামোগত পরিবর্তন হচ্ছে যেখানে, চলতি খাতে খরচের অংশটি বাড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেতন-কমিশনের সুপারিশ আসার পর বেতন ভাতা আরও বাড়বে, সুদের পরিমাণ বেড়েছে, ট্রান্সফার কার্যক্রমগুলো আরও

বিস্তার লাভ করেছে, বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব চলতি খাতের খরচকে টেকসই করতে হলে কর এবং জাতীয় আয়ের অনুপাত বাড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নাই। কারণ ঋণ করে চলতি খাতে খরচের অর্থায়ন করা যাবে না। সে কারণেই কর পদ্ধতি শুধু ব্যবসায়ীবান্ধব হলেই হবে না, এটিকে অর্থনীতি, দক্ষতা ও সমতা (ইকুইটি)-বান্ধবও হতে হবে। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা বর্তমান মূসক আইনের একটি প্রধান সমস্যা।

জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ এর সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, কর সংগ্রহ অর্থাৎ রাজস্ব আয় বেড়েছে বলেই সরকার উচ্চাভিলাষী বাজেট করতে পারছে। এখন ব্যবসায়ীদের আয় বেড়েছে, ফলে তারাও আগের চেয়ে কর বেশি দিচ্ছে। দেশে করদাতার সংখ্যা যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক কম সংখ্যক লোক কর প্রদান করে স্বীকার করে *জনাব আহমেদ* বলেন, করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এতে যারা নিয়মিত কর প্রদান করেন তাদের ওপর অযাচিত চাপ কমে আসতো। তিনি আরও বলেন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিশ্বাস করে সরকার দেশের উন্নতি করতে চায়। ব্যবসায়ীরাও সরকারের সেই উন্নয়নের অংশীদার হতে চায় উল্লেখ করে *জনাব আহমেদ* বলেন, হয়রানিমূলক ব্যবস্থা বন্ধ হলে এবং রাজস্ব বোর্ড ব্যবসায়ীদের আস্থা অর্জন করতে পারলে, ব্যবসায়ীরাও আরও বেশি কর দেবে, এবং তাদের জন্যও ব্যবসা করা সহজতর হবে।

জনাব এমএ মান্নান বলেন, যেহেতু অনেক উন্নয়নমূলক কাজের তাড়না আছে তাই রাষ্ট্র চালানোর জন্য সরকার বড় আকারের বাজেট করছে। এ বাজেট সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থ সরকারকে যতটা সম্ভব দেশের ভেতর থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এজন্য সরকার যে পন্থা অবলম্বন করে সেগুলো নতুন কিছু নয়। সারা বিশ্বেই যে উত্তম পদ্ধতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয় বাংলাদেশেও সে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এ উত্তম চর্চা পদ্ধতিকে সৎভাবে কাজে লাগাতে পারলে সরকারের অর্থ সংগ্রহও সহজ হবে।

মিজ ফেরদৌস আরা কর সংগ্রহ পদ্ধতির আধুনিকায়নের ওপর জোর দিয়ে বলেন সমস্ত পৃথিবীতে কর ব্যবস্থাপনা আধুনিক হয়ে আসছে। বাংলাদেশের মূসক আইনে কিছু ফাঁক ছিল যা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। নতুন এবং পুরোনো মূসক আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে নতুন আইনের মধ্যে এমন কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো হয়তো বেসরকারি খাতের জন্য উপকারী হবে। কারণ মূসক-এর মূল নীতি হলো দুটো, একটি হলো ব্যবসায়ী যে মূল্য ঘোষণা করবে সেটি রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে, দুই হচ্ছে ক্রেডিট নেওয়া। এ ক্রেডিট নেওয়ার পদ্ধতিটি যত তাৎক্ষণিক হবে ততই মূসক থেকে সুবিধা পাবার সুযোগ বেড়ে যাবে। এ দুটোর ভিত্তিতে নতুন আইনের মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তনগুলো নিয়ে আসা হয়েছে, অর্থাৎ এটিকে আরও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিণত করার যে কথা বলা হয়েছে সেটি অবশ্যই বেসরকারি খাতের জন্য উপকারী হবে। কিন্তু এটি সঠিকভাবে প্রয়োগ করার মতো প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এ মুহূর্তে রাজস্ব বোর্ড-এর আছে কিনা বা এটি করার জন্য তাদের কতদিন সময় লাগতে পারে- এসব বিষয়ে *মিজ ফেরদৌস আরা* প্রশ্ন তুলেন। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিপূর্ণভাবে যেতে পারলে হয়তো অনেক বেশি সুবিধা এখান থেকে নেয়া যাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সিপিডি-এর নির্বাহী পরিচালক *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান* মন্তব্য করেন যে, কর আদায় বাড়ানো না গেলে শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ীদের উপরই চাপ পড়ে। কারণ কর আদায় না হলে অবকাঠামো হয় না, ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার খরচ

অন্যদিক থেকে বেড়ে যায়। কোনো একটি নির্দিষ্ট খাতে ব্যয়ের চেয়ে মোট ব্যয় ব্যবসায়ীদের জন্য অবশ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হিসাবরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক সদস্য *জনাব আমিনুর রহমান* বলেন, আইনের পর্যালোচনা ও অংশীজনদের মন্তব্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে সব আইনের সঠিক প্রয়োগে বড় বাধা হলো হিসাবপত্র সঠিকভাবে রাখা। এক হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে এক লক্ষ বিশ হাজার কোম্পানি আছে। কিন্তু ইন্সটিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের হিসাব অনুযায়ী এর মধ্যে মাত্র ১৫ হাজার কোম্পানি অ্যাকাউন্টিং হিসাব বছরে নিয়মিতভাবে প্রদান করছে, আর এক লাখ পনের হাজার কোম্পানি করছে না। এ যদি কোম্পানির অবস্থা হয় তাহলে কোম্পানির বাইরে যারা আছেন তাদের অবস্থা তো আরও অনেক শোচনীয় হবার কথা। এ হিসাবপত্রগুলো যদি সঠিকভাবে না থাকে তাহলে দেখা যাবে কর যার কাছ থেকে সংগ্রহ করা প্রয়োজন তার কাছ থেকে না হয়ে অন্যের ওপরে এর চাপটা চলে যাচ্ছে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে *জনাব রহমান* হিসাব রাখার একটি সংস্কৃতি গড়ে তোলার প্রয়াসের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পূরোনো দিনের কথা স্মরণ করে বলেন যে, সে সময়ে সব রকমের দোকানে যে কোন কেনা বেচার দলিল হিসেবে ক্যাশ মেমো তৈরি হতো। যা বর্তমানে আর দেখা যায় না।

ড. মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম ও এ বিষয়ে একমত প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশে মূসক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে মূল সমস্যা হিসাবরক্ষণ। যেখানে তালিকাভুক্ত কোম্পানির হিসাবরক্ষণেই সমস্যা আছে সেখানে অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা হবেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মূসক তুলে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মূসক-এর সাথে সম্পৃক্ত হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থা সরলীকরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মত দেন।

এ প্রসঙ্গে *জনাব আলী জামান* মন্তব্য করেন যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবপত্র সংরক্ষণ বেশ দুরূহ একটি বিষয়। তারা অল্প পুঁজিতে ব্যবসা করেন; সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় সক্ষমতা তাদের নেই। আর বেতন দিয়ে হিসাবরক্ষক রাখার সামর্থ্যও তাদের নেই। তাই কাগজপত্রের জটিলতার কারণে হিসাব রেখে মূসক পরিশোধ করা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এ প্রসঙ্গে *জনাব সিদ্দিকুর রহমান* আইনটিকে আরও সহজ করার পরামর্শ প্রদান করেন।

জনাব ড. আবদুল মজিদ বলেন, সংকুচিত ভিত্তিমূল্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ২০০৭ সাল থেকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যে আগে গবেষণা হওয়া উচিত। বাংলাদেশে কোন ধরনের ব্যবসায়ী কতজন আছে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী কতজন সে হিসাবটি স্পষ্টভাবে থাকা উচিত। এ বিষয়গুলোর সঠিক হিসাব থাকলে সহজেই নির্ধারণ করা যাবে সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের আওতায় কতজন ব্যবসায়ী আসবেন। *জনাব মজিদ* আরও বলেন, এখন অর্থবিলের মাধ্যমে বারবার কেবল সংখ্যা বদলানো হয়। রাজস্ব বোর্ডের কাছে সব পর্যায়ের ব্যবসায়ীদের ধরনভিত্তিক হিসাব থাকলে মূসক নির্ধারণ করা সরকারের জন্য যেমন সহজ হবে তেমনি ব্যবসায়ীদের জন্যও মূসক পরিশোধ করা সহজ হবে। সর্বোপরি, এর ফলে মূসক ব্যবস্থায় একটি শৃঙ্খলাবিধান করা সম্ভব হবে।

সমাপনী বক্তব্য

সমাপনী বক্তব্যে *অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান* বলেন, নীতি-নির্ধারক, ব্যবসায়ি, রাজস্ব বোর্ড, গবেষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা, ভোক্তা সবার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে চারটি বিষয় উঠে এসেছে। প্রথমত সামষ্টিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূসক আইনের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে যেহেতু এসব নীতির সাথে শিল্পায়ন, বিনিয়োগ, ভোক্তা-স্বার্থ ও উৎপাদন ও ভোক্তার পর্যায়ে অভিঘাত এসব বিষয় সম্পৃক্ত। দ্বিতীয়ত মূসক আইন প্রনয়ণের প্রক্রিয়া। বিভিন্ন সময় মূসক আইন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপ-আলোচনা হয়েছে কিন্তু আলোচ্য বিষয়বস্তু সঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিষয় অস্পষ্ট থেকে গেছে এবং এ কারণে ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়েছে। তৃতীয়ত এ আইন নিয়ে আলোচনায় আইনের বেশ কিছু দুর্বলতার দিক চিহ্নিত হয়েছে। মূসক কত হওয়া উচিত এবং এর আওতা কি হবে তা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। কিছু কিছু বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে কিন্তু তারপরও মতপার্থক্য, উদ্বেগ ও আশংঙ্কা রয়ে গেছে। চতুর্থত: প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করতে না পারলে বাস্তবায়ন দুরূহ হবে, আর আশঙ্কাও দূর হবে না। আইনের বাস্তবায়নের আগে প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো সম্পাদন করা জরুরী।

অধ্যাপক রহমান আশা প্রকাশ করেন যে, রাজস্ব বোর্ড এ সব বিষয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২০১২ সালে প্রস্তাবিত আইনের সংশোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, এখন আইন কিছুটা হয়তো সংশোধন করা হবে, সরকারও একটি কমিটি গঠন করেছে, আলাপ-আলোচনা এখনো চলছে। ১৯৯১ এর পরবর্তীতে দেখা গেছে যে ইলেকট্রনিক ক্যাশ রেজিস্টার সফলভাবে স্থাপন না করতে পারার কারণে বিভিন্ন সমস্যা হয়েছে। এখন ইলেকট্রনিক ইন্টারফেস চালু করার কথা বলা হচ্ছে। বলা হচ্ছে যে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আইসিটির সাহায্য নেয়া হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইয়ড করা সম্ভব না হলে করের ওপর যে রেয়াত পাবার কথা তা কার্যকর করা দুরূহ হবে। সবশেষে *অধ্যাপক রহমান* একটি প্রাণবন্ত আলোচনার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানান।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

(বর্ণানুক্রমে অনুসারে)

জনাব কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ	সভাপতি, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)
মিজ ফেরদৌস আরা বেগম	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট
ড. এ বি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম	তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা
জনাব আরিফুল ইসলাম	সহকারী কমিশনার- ট্যাক্স জাস্টিস ক্যাম্পেইন, সুপ্র
জনাব মোঃ আহসানুল করিম	উপ-পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট
জনাব তৌফিকুল ইসলাম খান	রিসার্চ ফেলো, সিপিডি
ড. ফাহমিদা খাতুন	গবেষণা পরিচালক, সিপিডি
জনাব শাহ মোঃ আবদুল খালেক	অতিরিক্ত সচিব, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)
মিজ কামরুন্নাহার চৌধুরী	প্রোগ্রাম এ্যাসিস্ট্যান্ট, বিশ্বব্যাংক
জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	উর্ধ্বতন কমকর্তা, মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
জনাব আলী জামান	সভাপতি, এসএমই ওনার্স এসোসিয়েসন অফ বাংলাদেশ
জনাব এলিসন সুব্রত বাড়ৈ	পরিচালক, সুপ্র
ড. আহসান হাবিব মনসুর	নির্বাহী পরিচালক, পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ
ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
জনাব এম মুনিরুজ্জামান	নির্বাহী সদস্য, ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অফ স্মল অ্যান্ড কটেজ ইন্ডাস্ট্রিজ অফ বাংলাদেশ
জনাব মোঃ আমিনুর রহমান	সাবেক সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান	নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি
জনাব সিদ্দিকুর রহমান	পরিচালক, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)
জনাব মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন	সাবেক সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
জনাব আবু মনসুর সাইফ	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এসএমই ফাউন্ডেশন
জনাব এম এস সিদ্দিকী	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বাংলা কেমিক্যাল
জনাব ব্যারিস্টার জাহাঙ্গির হোসেন	সদস্য (ভ্যাট নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
জনাব মোঃ তৌহিদ হোসেন	এফএভিপি, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি:
ড. জাহিদ হোসেন	লীড ইকনমিষ্ট, বিশ্বব্যংক

সাংবাদিকদের তালিকা

(বর্ণানুক্রমে অনুসারে)

জনাব ফয়সাল আতিক	বিডিনিউজ24
জনাব হাসিবুল আমান	স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, দি ডেইলি সান
জনাব মেহেদী হাসান আলবকর	সিনিয়র রিপোর্টার, ইটিভি
জনাব মোরশেদ আলম	স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, এটিএন বাংলা
জনাব জসিম উদ্দিন	সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট, দি নিউ এজ
জনাব খলিল	স্টাফ রিপের্টার, দৈনিক সংগ্রাম
জনাব আলাউদ্দিন চৌধুরী	স্টাফ রিপের্টার, দৈনিক, ইত্তেফাক
জনাব আব্বাস উদ্দিন নয়ন	স্টাফ রিপোর্টার, অর্থসূচক
জনাব আতিক বাবু	স্টাফ রিপোর্টার, দেশ টেলিভিষণ
জনাব বিপ্রজিত বাপ্পা	স্টাফ রিপোর্টার, মোহনা টেলিভিষণ
মিজ মেহের মনি	সিনিয়র রিপোর্টার, রেডিও টু ডে
মিজ দৌলত আখতার মালা	স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস
জনাব মোঃ গোলাম মেসবাহ	সিনিয়র রিপোর্টার, বৈশাখী টেলিভিষণ
জনাব মেহেদী	স্টাফ রিপোর্টার, শীর্ষনিউজ.কম
মিজ ফারজানা রশিদ লাবনী	স্টাফ রিপোর্টার, কালের কণ্ঠ
জনাব জাহাঙ্গির শাহ	সিনিয়র রিপোর্টার, দৈনিক প্রথম আলো
জনাব নাজমুল হাসান শুভ	দৈনিক সমকাল
জনাব ফাতাহ উদ্দিন সজল	বিজনেস-ইন-চার্জ, এশিয়ান টিভি
জনাব সবুজ সরকার	ফটোগ্রাফার, এশিয়ান টেলিভিষণ
জনাব হামিদ সরকার	সিনিয়র ইকোনমিক রিপোর্টার, দৈনিক নয়াদিগন্ত
জনাব সাইফুদ্দিন	স্টাফ রিপোর্টার, দৈনিক সকালের খবর
জনাব হরি সাহা	স্টাফ রিপোর্টার, সময় টেলিভিষণ
জনাব রাশেদ সুমন	ফটোগ্রাফার, দি ডেইলি স্টার
জনাব আনিসুর সুমন	চ্যানেল আই
জনাব ছদরুল হাসান	স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, ইউএনবি
জনাব হারুন	দৈনিক আমাদের সময়
জনাব ইসতিয়াক হোসেন	স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট, বাংলানিউজ24